প্রতিবেদন

বই ও প্রযুক্তি

শিক্ষকের নাম:

ড. এ. কে. এম. আশরাফউদ্দিন

ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ এন্ড মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি

প্রদানকারী:

মোঃ রায়হান খান

আইডি: ১৮৩১১১৮০৪২

সিরিয়াল: ৫০

সেকশন: ১৫

জমার তারিখ: ২৮-১১-২০১৯

বই ও প্রযুক্তি

সাহিত্য যখন ওরাল ফর্ম থেকে লিখিত রূপে আশ্রয় গ্রহণ করতে শুরু করেছে এক অর্থে তখন থেকেই সে প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত হতে শুরু করেছে।

আজকের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে তুলনা করলে সেই আদিম প্রযুক্তিকে যতই সেকেলে মনে হোক না কেন, কিন্তু তা ছিল মানুষের সরল প্রযুক্তি জ্ঞানেরই উন্মেষ।

পশুর চামড়া, ভূর্জপত্র তালপাতা, প্যাপিরাস, পাথর কিংবা ধাতববস্তুতে সাহিত্যিক সৃজনশীলতাকে উৎকীর্ণ করে রাখার এই উপায় উদ্ভাবন ছিল সেকালের মানুষের প্রযুক্তি জ্ঞানেরই প্রয়োগ। আজকের দিনে সাহিত্য ও প্রযুক্তিকে যতই অবন্ধুসুলভ বা বিরোধাত্মক মনে হোক না কেন, তারা প্রায় শুরু থেকেই ছিল বন্ধুপ্রতিম।

আজকে প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ ও বিস্ফোরণের যুগে পরস্পরের বন্ধুপ্রতিম সম্পর্ক নিয়ে কারও কারোর মধ্যে সংশয় তৈরি হয়েছে।

বন্ধুপ্রতিম এই সম্পর্ক আদৌ টিকবে কিনা এ নিয়ে অনেকেরই সংশয়। সংশয়ের কারণও আছে। সাহিত্যের আবেদন আমাদের হৃদয়বৃত্তির কাছে, সাহিত্য আমাদের সংবেদনশীলতাকে জাগ্রত ও সম্প্রসারিত করার জন্য, প্রায় দাসে পরিণত হওয়া নিঃস্ব মূল্যবোধ ও অভ্যাসগুলোকে প্রশ্ন করার জন্য। অন্যদিকে প্রযুক্তির কাজ আমাদের হৃদয় ও অন্তর্মহলের হসিদ নেয়া নয়, বরং আমাদের আরামআয়েশ ও ভোগের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা। তার কাজ সাহিত্যের মতো

মানুষকে জাগ্রত করা নয়, বরং জাগ্রত মানুষের বস্তুগত ও শারীরিক সুবিধার জোগান দেয়া। উভয়ের লক্ষ্য ভিন্ন হলেও পরস্পরকে কখনোই বিরোধী অবস্থানে যেতে হয়নি।

এমনকি লিখিত রূপের আদিম আশ্রয়গুলো থেকে মধ্যযুগে গুটেনবার্গের আবিষ্কৃত মুদ্রণ যন্ত্রের সুবিধায় সাহিত্য যখন গণমণ্ডলে ব্যাপকভাবে সহজলভ্য হওয়ার সুযোগ পেল তখনও প্রযুক্তি তার উত্তম বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়েছে। গুটেনবার্গ মুদ্রিত বইয়ের মাধ্যমে সাহিত্যকে গণমানুষের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে মানুষকে চিন্তা ও ভাবনার প্রতি অনেক বেশি উস্কে দিয়েছে।

আগে বইয়ের অধিকারী মুষ্টিমেয় কয়েকজন অভিজাত ও পণ্ডিতের কাছে থাকায় সে সম্পর্কে কথা বলার বা চিন্তাচর্চার অধিকার কেবল তাদেরই ছিল। গুটেনবার্গ তাদের সেই একচেটিয়া অধিকারকে খর্ব করে পাঠের ও ভাবনার সুযোগ উন্মোচন করে দিলেন জনগণের কাছে। এত শত বছর পরেও গুটেনবার্গের এই বিপ্লবী পদক্ষেপের সুবিধা ভোগ করছি আমরা।

তবে সুবিধার এই সুফল কত দূর গড়াবে এ নিয়ে সংশয় দেখা দিল গত শতাব্দীর ৮০ দশক থেকে, ঠিক যখন থেকে অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের বিস্তার ঘটতে শুরু করেছে।

অনেক বুদ্ধিজীবী ও গবেষক এই আশঙ্কা করতে শুরু করলেন যে সাহিত্য তো দূরের কথা, গুটেনবার্গ গ্যালাক্সিই আসলে অদূর ভবিষ্যতে থাকবে কিনা।

১৯৮৭ সালে পেরুর কথাসাহিত্যিক নোবেল বিজয়ী মারিও বার্গাস যোসা 'বুক গেজেট এন্ড ফ্রিডম' নামক এক প্রবন্ধে একটা মজার ঘটনা উল্লেখ করে বইয়ের প্রতি প্রযুক্তির হুমকি নাকচ করে দিয়ে বলেছিলেন : 'খুবই' দুঃখজনক একটি বক্তৃতার কথা আমার মনে পড়ছে যা বেশ কয়েক বছর আগে কেমব্রিজে শুনেছিলাম। 'শিক্ষা মানে কষ্টভোগ'- এরকমই ছিল তার শিরোনাম এবং এর প্রসঙ্গ ছিল বর্ণমালাভিত্তিক সংস্কৃতি, অর্থাৎ বই ও লেখার যুগের অবসান।

বক্তার ভাষ্য অনুযায়ী, অডিও ভিজ্যুয়াল সংস্কৃতি এসে এই জায়গাটি অচিরেই দখল করবে। লিখিত ভাষা যা-কিছুই প্রকাশ করুক না কেন, ইতিমধ্যে তা যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়েছে। কারণ, আমাদের সমকালের অভিজ্ঞতামূলক জরুরি জ্ঞান রূপান্তরিত হয়ে সংকেতের মাধ্যমে জমা হচ্ছে যন্ত্রে, বইয়ে নয়।

বক্তা নাকি সপ্তাহ দুয়েক মেহিকোতে কাটিয়েছিলেন এবং সর্বত্রই ঘুরে বেড়িয়েছেন, তার কোনো অসুবিধা হয়নি, যদিও তিনি স্পানঞ্জল ভাষা ব্যবহার করেননি।

কারণ তিনি বলেন, সেখানে পথনির্দেশক, নির্দেশক-আলো এবং প্রতীকচিহ্নসমূহ তাকে সহযোগিতা করেছে। তিনি আরও বলেন, এই ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাষার বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম।

বর্ণমালার জীবন মানব ইতিহাসের যে কোনো পরিস্থিতিতেই ক্ষণস্থায়ী। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন, বইয়ের সংস্কৃতি কিছু নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে টিকে থাকবে এবং সামাজিক পরগাছা শ্রেণীই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আনন্দ বা বিনোদনের জন্য বই প্রকাশ এবং ব্যবহার করতে আগ্রহী।

যে থিসিসটির কথা বলা হল তার প্রবক্তা সেই মার্শাল ম্যাকলুহান নন, যিনি বলেছিলেন, ১৯৮০ সালের মধ্যেই বই লুপ্ত হয়ে যাবে। যদিও বই নয়, বরং তার নাম এবং তার প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতি ও প্রযুক্তিবিদ্যা প্রতিষ্ঠানটিই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই থিসিসটির প্রবক্তা ছিলেন স্যার এডমন্ড লিচ, প্রখ্যাত ইংরেজ নৃবিজ্ঞানী এবং পরবর্তী সময়ে কিংস কলেজের প্রভোস্ট।'

মারিও বার্গাস যোসার এই লেখাটির আরও প্রায় ২০ বছর পর, '২০০৮ সালে দাভোসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে, একজন ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন, আগামী পনেরো বছরের মধ্যে চারটি বিশেষ বাস্তবতা পৃথিবীকে দারুণভাবে বদলে দেবে : প্রথমটি হল তেলের ব্যারেল-প্রতি দাম হবে ৫০০ মার্কিন ডলার, দ্বিতীয়টি, জলও তেলের মতো বাণিজ্যিক পণ্য হয়ে উঠবে এবং শেয়ারবাজারে দরদাম চলবে তার, তৃতীয়টি হল আফ্রিকার অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে অনিবার্য

আত্মপ্রকাশ আর চতুর্থটি হল বইয়ের অন্তর্ধান।' ('কী হবে আমার বইগুলোর,' কুমার চক্রবর্তী, পরস্পর, জুন ২০, ২০১৬)

এই ভবিষ্যদ্বক্তা বইয়ের অন্তর্ধানের জন্য যে পনেরো বছরের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন তা থেকে ইতিমধ্যে ১০ বছর গত হয়েছে। তাহলে আমাদের আরও পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হবে তার ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যাসত্য দেখার জন্য।

একটা বিষয় তো সত্যি যে, প্রযুক্তির ক্রমোন্নতির ফলে মানুষের বেশিরভাগ জিনিসই বিবর্তিত হতে হতে তা আদি রূপ থেকে বদলে গেছে আমূল। ধরা যাক উড়োজাহাজের কথাই, গত শতাব্দীর প্রথম দশকে সেই রাইটভাতৃদ্বয়ের উদ্ভাবিত রূপটি বদলাতে বদলাতে আজকে যে-রূপ ধারণ করেছে তা অবিশ্বাস্য। দ্রুতগতির এই পরিবর্তনের সঙ্গে বই সেই তুলনায় বদলেছে খুবই কম। এতই কম যে তাকে বদল বলে মনেই হয় না।

এই বিষয়ে ইতালির কথাসাহিত্যিক উম্বের্তো একোর একটা চমৎকার পর্যবেক্ষণ আছে। তিনি বলেছেন, 'বই হলো চামচ, হাতুড়ি বা কাঁচির মতো, একবার আবিষ্কারের পর তার আর তেমন উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে সাফল্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। বই বিলুপ্তির যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তা এসেছে ইন্টারনেটের কারণে যা মূলত ই-পাঠের বিষয়। এক সময় সিনেমা, রেডিও বা টেলিভিশনকেও ভাবা হয়েছিল বইয়ের ঘাতক।' (তদেব) এটা ঠিক যে বই বিলুপ্ত হলে, বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হবে সাহিত্য। কিংবা বিলুপ্ত না হলেও সাহিত্য একটা বড় ধরনের সংকটের মধ্যে পড়বে- এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সাম্প্রতিক কিছু তথ্যের দিকে যদি তাকানো যায়, তাহলে দেখা যাবে প্রযুক্তিকে সাহিত্যের জন্য যতটা হুমকি ভাবা হয়েছিল আসলে সে হুমকিতো নয়ই, বরং আগের মতোই সহযোগীর ভূমিকায় রয়েছে। তাই যদি না হবে তাহলে প্রকাশনা শিল্পটি বিলুপ্ত না হয়ে বরং এখনও টিকে আছে কী করে? এটা ঠিক যে বইয়ের টিকে থাকা বলতে সাহিত্যের টিকে থাকা নাও বুঝাতে পারে। কারণ মানুষ সাহিত্য-বিমুখ থেকেও বেঁচে থাকার জন্য তার অন্যান্য জ্ঞানের অনুশীলনের জন্য বই দরকার হবেই। যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত, স্থাপত্য, পদার্থবিজ্ঞন, রসায়ন, প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয় যেহেতু মানুষের বহিরাঙ্গিক প্রয়োজন মেটানোর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত ফলে মানুষের শারীরিক বেঁচে থাকার জন্য ওই বিষয়ে বইয়ের প্রয়োজন সবসময়ই। কিন্তু এখনও পর্যন্ত যেসব জরিপ পাওয়া যায় তাতে করে এটা বলা অসম্ভব যে মানুষ সাহিত্যবিমুখ হয়ে পড়েছে। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, লেখক বিক্রম শেঠকে নতুন পাণ্ডুলিপির জন্য এক দশমিক সাত মিলিয়ন ডলার দেয়া হয়েছিল। পাণ্ডুলিপি সময় মতো দিতে পারেননি বলে সেই প্রকাশনী ডলারগুলো ফেরত চেয়েছে ২০১৩ সালে। এই তথ্য আমাদের এটাই অনুমান করতে উদ্বুদ্ধ করে যে এই প্রযুক্তির যুগে বইয়ের চাহিদা মরে যায়নি। বই যে এখনও দুর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করছে তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়ার চেষ্টা করব এই মুহূর্তে। স্প্যানিশ সাহিত্যের জগতে দুটো বিখ্যাত গ্রন্থের বিক্রি কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে তার হদিস নিলেই দেখা যাবে সাহিত্যের

পাঠকপ্রিয়তার বিষয়টি। সের্বান্তেসের দন কিহোতে এ পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে ৬০০ মিলিয়ন কপি। আর অন্য একটি যেটি আধুনিক চিরায়ত সাহিত্যের মর্যাদায় অভিষিক্ত, সেই হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচ্যুড বিক্রি হয়েছে ৩০ মিলিয়ন কপি। আমি নিশ্চিত এই শেষের বইটির ভিত্তিতে যদি হলিউডে কোনো সিনেমা তৈরি হতো তাহলে এর বিক্রি দ্বিগুণ বা তিন হতে পারত কিংবা আরও বেশি। যখনই কোনো উপন্যাস অবলম্বনে সিনেমা কিংবা টিভিনাটক তৈরি হয় তখন তার বিক্রি বেড়ে যায় বহুগুণে। অন্যদিকে, প্রযুক্তির বিশেষ কয়েকটি মাধ্যমে প্রবেশ করে সাহিত্য পাঠকপ্রিয়তার যে সুফল পেয়েছে তা আমাদের কাছে এখন এক প্রমাণিত সত্য। অথচ মনে করা হয়েছিল প্রযুক্তির নতুন নতুন মাধ্যম বুঝিবা কাগজনির্ভর সাহিত্যপুস্তককে কোণঠাসা করে ফেলবে। এখনও পর্যন্ত জরিপের ফলাফল আমাদের আশঙ্কা থেকে কেবল মুক্তই নয়, বরং সাহিত্যের বিস্তার সম্পর্কে আরও বেশি আশ্বান্বিত করছে। পৃথিবীর দুটো গণমাধ্যমের দুটো প্রতিবেদনের দিকে তাকালেই আমরা তা বুঝতে পারব। ২০১৫ সালের ১৪ আগস্টে 'বিবিসি নিউজ'- এ প্রকাশিত Padraig Belton এবং Matthwe Wall এক প্রতিবেদনে জানিয়েছেন যে 'Literature found itself at war with the internet,' as Jim Hinks, digital editor of Comma Press, succinctly puts it. But contrary to expectations, the printed book is still surviving alongside its upstart e-book cousin and technology is helping publishers and retailers reach new audiences and find new ways to tell stories.

তার মানে প্রযুক্তি এসে সাহিত্যকে হটানো দূরের কথা, উল্টো সাহিত্য তার প্রাচীন বেশভূষা নিয়ে বহাল তবিয়তেই আছে। আর আছে মানে কি, এই একই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে while there can be no denying that printed book sales have taken massive hit with the rise of digital, there is some evidence that the rate of decline is slowing and that the excitement over e-readers subsiding.

একটা লক্ষণীয় ব্যাপার হল, ধারণা করা হয়েছিল ই-বুক এবং কিন্ডল এসে বুঝি পুস্তকের চাহিদাকে কমিয়ে দেবে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে পাঠের এই দুটো মাধ্যমে কৌতূহলবশত পাঠকরা আকৃষ্ট হলেও এখন ধীরে ধীরে এগুলো জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। এই একই প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে ২০১১ সালে কিন্ডল-এ বইয়ের বিক্রি উঠেছিল ১৩ দশকিম ৪৪ মিলিয়ন কিন্তু পরের বছরই এর বিক্রি কমে গিয়ে দাঁড়াল ৯ দশমিক ৭ মিলিয়নে। ২০১৭ সালের ১৪ মার্চে 'দি গার্ডিয়ান'-এ E-book sales continue to fall as younger generations drive appetite for print শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে মানুষ মুদ্রিত বইয়ের দিকে ফিরে যাচ্ছে। এই প্রতিবেদনে বিস্তারিত তথ্য ও জরিপ হাজির করে দেখানো হয়েছে প্রতি বছর ই-বুক পতনের হার এবং মুদ্রিত বইয়ের ক্রম-বিস্তার। যদিও বইয়ের মাধ্যমে প্রকাশিত সাহিত্যের কদর সম্পর্কে আমাদের সংশয় অনেকটা কেটে গেলেও কয়েকটি বিষয়ে এখনও আশঙ্কা কাটেনি বলে আমি মনে করি। সুসমাচার দিয়ে শুরু করলেও সঙ্কটের সম্ভাবনাকেও আমলে নিয়ে বাস্তব চেহারাটা বুঝার দরকার আছে।

ই-বুক কিন্ডল ও পিডিএফ-এর পর এখন ফেসবুক এসে সৃজনশীলতা প্রকাশের ও প্রচারের আরেকটি দরজা উন্মোচন করে দিয়েছে। এই অবারিত সুযোগের ফলে এখানে কবিতা গল্প প্রবন্ধ এমনকি উপন্যাসও খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করার সুযোগ আছে। কিংবা সরাসরি যদি এই মাধ্যমে নাও লেখা হয়, অন্তত অন্য মাধ্যমে প্রকাশিত লেখাটির তথ্য বা প্রতিবেদন এখানে দেয়া সম্ভব। ফেসবুকে এই দুটো ঘটনাই ঘটছে। তারও সুফল লেখক এবং পাঠকরা পাচ্ছেন। সুফলটা হচ্ছে প্রচারের। কিন্তু এই মাধ্যমে সরাসরি লেখার একটা বিপদ এই যে, ফেসবুক যেহেতু খুবই আকর্ষণীয়, আকর্ষণীয় যেহেতু লেখাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত সবার নজরে আসছে, সঙ্গে সঙ্গেই জানানো হচ্ছে লেখাটি সম্পর্কে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। এসব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় উচ্ছ্বাস যেমন আছে, তেমনি আছে বিপরীত অনুভূতিও। ফেসবুকে লেখা এবং এর তাৎক্ষণিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াগুলো দেখতে পাওয়ার প্রলোভন সত্যিকারের লেখকের চিন্তার সংহতি, ভাবনার ক্রিস্টালাইশনের পক্ষে কতটা অনুকূল তা বলা মুশকিল। যেহেতু দ্রুততা ও তাৎক্ষণিকতা এই মাধ্যমের মূল দর্শন, ফলে লেখকের লেখাটি পরিপূর্ণ রূপে দানা বাঁধার আগেই তা প্রিমেচ্যুর ইজাকুলেশনের মতো নিঃসৃত হতে পারে। আমি নিজে যদিও ফেসবুকের একজন নিয়মিত ব্যবহারকারী, কিন্তু এর বিপদ ও ফাঁদ সম্পর্কে শংকিত না হয়ে পারি না। ফেসবুকের প্রসঙ্গ আনতে হল এই কারণে যে অনেক তরুণ লেখকই এখন ফেসবুকে ভিড় করছেন। এমনকি, প্রবীণরাও বাদ যাচ্ছে না। আমার নিজের ধারণা ফেসবুক দূরপাল্লার কোনো সাহিত্যিক বাহন নয়, এ হচ্ছে ফেদেরিকো গার্সিয়া লোর্কার কবিতার Casada infiel, পত্নী অবিশ্বাসিনী, যে আপনাকে দুদণ্ড শান্তি ও সম্ভোগ দেবে ঠিকই, কিন্তু সে আপনার ঘরনি নয়। ফেসবুকের প্রলোভন এতই তীব্র যে আপনার চিন্তা ও অনুভূতিকে সে থিতু হতে দেয় না, এ হচ্ছে গ্রিক পুরানের সেই সাইরেন যার সুমধুর সুর আর সৌন্দর্য আপনাকে অগভীর ও অস্থির জনস্রোতের মধ্যে চুবিয়ে মারবে। তবে প্রবল সংযমীর জন্য সেই বিপদ নেই- এটাও বলা রাখা ভালো।

প্রযুক্তির এত সব স্রোতের মধ্যেও পুস্তক ও সাহিত্য তার সম্ভাবনা নিয়ে যে টিকে আছে তার একটাই কারণ, মানুষ তথ্যের ক্ষুধার পাশাপাশি সৃজনশীলতা ও সৌন্দর্যবোধের স্পৃহা এখনও ত্যাগ করেনি, করবেও না কোনো কালে। কারণ এটি তার সত্তার মৌলিক বৃত্তি ও স্ফূর্তি।

প্রতিটি যুগেই প্রযুক্তির নতুন নতুন উদ্ভাবন ও বিজ্ঞানের অভিনব সব আবিষ্কারের কারণে মানুষের ব্যবহৃত বস্তু-সামগ্রীর মধ্যে কখনও কখনও কাঠামোগত পরিবর্তন দেখা দেয়। বইয়ের ক্ষেত্রেও সেটা যে ঘটেছে তা আমরা আগেই লক্ষ করেছি। পরিবর্তনের এই অভিঘাতে বাংলাসাহিত্য সঙ্কটের মুখে পড়বে কিনা- সেটা যে একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দেবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমাদের এই দেশ ইতিমধ্যেই প্রযুক্তির পক্ষে গিয়ে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বলে ঘোষণা ও প্রচার শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গে তেমন কোনো ঘোষণা ও প্রচার না থাকলেও বইয়ের ক্ষেত্রে উভয় দেশের অভিজ্ঞতা খুব একটা ভিন্ন হওয়ার কথা নয়। বাংলাসাহিত্যের প্রকাশ এখন বইয়ের মাধ্যমে যেমন আছে, তেমনি প্রযুক্তির বদৌলতে এখন তা নানা মাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়ছে দেশের

গণ্ডি পেরিয়ে বিভিন্ন দেশের পাঠকদের মধ্যে। ই-বুক, পিডিএফ, এইচটিএমএল এবং অনলাইন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে পাঠকরা ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়ে যেতে পারে ইচ্ছেমতো। বাংলাসাহিত্য পাঠ ও প্রচারের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির এই অবদানকে কোনোভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রযুক্তি দ্বারা উদ্ভাবিত এসব মাধ্যমে সাহিত্য আশ্রয় লাভের কারণে বই ভঙ্গুর ও জীর্ণ হওয়া থেকে যেমন নিজেকে রক্ষা করতে পারে, তেমনি মুহূর্তেই অনুরূপ ও স্থানান্তরের সুবিধাও সে অর্জন করেছে।

এসব মাধ্যমে এসে বই নিজেকে শারীরিকভাবে বিলুপ্তির হাত থেকেও বাঁচাতে পেরেছে। আমার কাজের সঙ্গে পুরনো বইপত্রের একটা সম্পর্ক থাকার কারণে বহু বইপত্র যেগুলো দূরবর্তী বা পুস্তক-আকারে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব তা আমি পেয়ে গেছি প্রযুক্তির সৌজন্যে। সুতরাং প্রযুক্তিকে আমি কখনোই বাংলাসাহিত্যের জন্য হুমকি হিসেবে তো দেখিই না, বরং সূচনালগ্নের সেই বন্ধুত্ব যার কথা আমি শুরুতেই বলেছি, তারই সম্প্রসারণ ঘটে চলেছে আজও।

মোঃ রায়হান খান
আইডি: ১৮৩১১১৮০৪২
কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ (সিএসই)
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইলঃ raihan.khan01@northsouth.edu